মাসুদ রানা

একাত্তরের বৈশাখ : প্রথম পর্ব

১৯৭১ সালে অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে বাংলাদেশে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী যে নির্মম গণহত্যা শুরু করেছিল তা প্রায় পরবর্তী নয় মাস অব্যাহত ছিল। একজন পর্যবেক্ষক ১৯৭২ সালে বলেছিলেন, এই নয় মাসে এই ভূখণ্ডে যাবতীয় মানবাধিকার উধাও হয়ে গিয়েছিল, থমকে গিয়েছিল। কেবল সরকার বা সেনাবাহিনীই নয়, অস্ত্র আছে এমন যে কেউই জান ও মালের উপর একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করেছিল, এবং যখন ইচ্ছে তখনই সেই কর্তৃত্ব ব্যবহার করতো।[১] মাঠপর্যায়ের গবেষণা ও স্মৃতিকথাতে এই ভয়াবহতা বিভিন্নভাবে উঠে এসেছে, এবং এখনো আসছে।

একাত্তরের নয়মাসের ঘটনাপ্রবাহ, বিশেষ করে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা-নির্যাতন ও নিপীড়নকে বিভিন্ন কালিক পর্যায়ে ভাগ করা হয়। যেমন, ১৯৭২ সালে প্রকাশিত *দি ইভেন্টস ইন ইস্ট পাকিস্তান* -এ পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণকে তিনটা পর্যায়ে ভাগ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে পুরো বাঙালি জনগোষ্ঠীর ওপর আক্রমণ করা হয়, যার শুরু হয়েছিল মার্চে, দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে হিন্দু জনগোষ্ঠী নিধন। হয় মেরে ফেলা, না হয় ভয় উৎপাদন করে উচ্ছেদ করা। তৃতীয় পর্যায়ে হচ্ছে প্রতিশোধমূলক আক্রমণ। মুক্তিবাহিনীর কোনো আক্রমণ, বা গেরিলা যুদ্ধের পরপরই কোনো একটা গ্রামকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে, গ্রামবাসীকে মুক্তিযোদ্ধাকে সহায়তা করার অভিযোগ তুলে অধিকাংশকে হত্যা করা হচ্ছে।[২] মুক্তিবাহিনীর উপপ্রধান সেনাপতি একে খন্দকারের ভাষ্যতেও এই তৃতীয় পর্যায়ের প্রমাণ পাওয়া যায়, বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। একদিকে গেরিলাদের এই সামান্য অস্ত্রের কারণে পাকিস্তানিদের হাতে তাদের জীবনদান, অন্যদিকে যেখানে-সেখানে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে পালিয়ে যাওয়ার পর পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক ওই সব এলাকা

বা গ্রামে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ।[৩] উপরোক্ত পর্যায়ের উপর ভিত্তি করে ইয়েলেনা এবং রাচেলও একাত্তরের নয় মাসকে তিনটা পর্যায়ে ভাগ করেন। মার্চ-এপ্রিলকে বলা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ত্রাস, মে-আগস্ট গণহত্যা ও এথনিক ক্লিনজিং এবং আগস্ট-ডিসেম্বর প্রতিশোধমূলক হত্যাযজ্ঞ বা ধ্বংসযজ্ঞ।[৪] এই পর্যায়গুলো একেবারে মোটাদাগে বিভক্ত, এমন কোনো কঠিন দেয়াল এদের মধ্যে নেই। যেমন, ইয়েলেনা ও রাচেল আগস্ট-ডিসেম্বরকে প্রতিশোধমূলক আক্রমণের কাল হিসাবে চিহ্নিত করলেও এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান, এস আর মির্জা এটাকে জুন-জুলাই মাসের মধ্যে ফেলেন। যদিও অন্যান্যরা গবেষকরা পুরো নয় মাসকেই গণহত্যা-নির্যাতনের কাল বলে অভিহিত করেন।[৫] তদপুরি এই কালবিভাগ আক্রমণের ধরণ সম্পর্কে আরো বেশি ওয়াকিবহাল করে। উপরোক্ত দুটো গবেষণা ও প্রতিবেদনের প্রথম দুটো পর্যায়ের মাঝামাঝি অবস্থায় আছে এপ্রিল-মে মাস। ফলে এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ের উত্তরণের কালে কী পরিমাণ ভয়াবহতা হয়েছে তা তুলে ধরার জন্যই বৈশাখ (এপ্রিল-মে) মাসকে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রাথমিক প্রতিরোধও এই সময়ে শেষ হয়ে গিয়েছে, পাকিস্তানি বাহিনী ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে শহরে, গ্রামে, কেন্দ্র থেকে প্রান্তে। সেই সাথে বাড়ছিল গণহত্যার ভয়াবহতা।

তৎকালীন পত্রপত্রিকায়, বিশেষত ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে, নিয়মিত একাত্তরের ভয়াবহ গণহত্যার সংবাদ প্রকাশিত হতো। যেমন, ১৬ এপ্রিলে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়েছিল, '*যশোহর জেলায় পাক সৈন্যরা বাড়ীর মেয়েদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে হত্যা। যশোহর জেলায় দ'জন যুবক নির্মমভাবে ঐ হত্যাকাণ্ডে কাহিনী মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শুরকে জানান। মেয়র এক বিবৃতিতে ঐ কথা লেখেন। যুবকরা মেয়রকে জানান পাক সৈন্যরা ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দিচ্ছে। পিতার সামনে পুত্রকে এবং মার সামনে ছেলেকে হত্যা করছে। কারখানাগুলী বোমা মেরে ধ্বংস করা হয়েছে। পেট্রাপোল আশ্রয় শিবিরে ৩৫০০ উৎবাস্তু আছে। শিবিরে ৫ হাজার লোককে আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা আছে। দু-একদিনের মধ্যে ঐ সংখ্যা ছাড়িয়ে যাবে। বররায় আশ্রয় শিবিরে ১৫ হাজার লোক আশ্রয় নিয়েছে।*'[৬] কিন্তু, এই প্রবন্ধের জন্য পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণগুলো বাদ দেয়া হয়েছে। কেননা, প্রায়শই সংবাদ পরিবেশনে অতিরঞ্জন করা হতো। এই প্রবন্ধে প্রধানত নির্ভর করা হয়েছে মাঠ পর্যায়ের গবেষণার ওপর। ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর এর অধীনে গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপের গবেষকরা মাঠ পর্যায়ে গিয়ে যে তথ্য যোগাড় করেছেন সেগুলোর ওপর ভিত্তি করেই এই কালানুক্রমিক ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

পহেলা বৈশাখ বঙ্গাব্দের প্রথম দিন, তথা বাংলা নববর্ষ। দিনটি সকল বাঙালী জাতির ঐতিহ্যবাহী বর্ষবরণের দিন। দিনটি বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নববর্ষ হিসেবে বিশেষ উৎসবের সাথে পালিত হয়। বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকার তারিখ অনুযায়ী একাত্তর সালে বৈশাখ মাসের প্রথম দিন ছিল ১৫ এপ্রিল। কিন্তু বর্তমানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিন ১৪ এপ্রিল। লোকনাথ পঞ্জিকাতে ১ বৈশাখ ১৫ এপ্রিলে পড়ে। অর্থাৎ ১৫ এপ্রিল ১ বৈশাখ।

১

পহেলা বৈশাখ ১৩৭৮। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার, ১৫ এপ্রিল ১৯৭১। ঈদ, পূজার মতো বাঙালি জাতির অন্যতম একটি উৎসব পহেলা বৈশাখ। দিনটি সকল বাঙালী জাতির ঐতিহ্যবাহী বাংলা বর্ষবরণের দিন। দিনটি বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নববর্ষ হিসেবে বিশেষ উৎসবের সাথে পালন করা হয়। ১লা বৈশাখ উৎসব না করে প্রাণ বাঁচাতে অসংখ্য মানুষ ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ১৬ এপ্রিল *যুগান্তর* পত্রিকায় এই সম্পর্কে একটি প্রতিবেদনে বলা হয়-

পাবনা ও কুষ্টিয়া থেকে ১০ হাজার শরণার্থী নদীয়া জেলায় প্রবেশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই নারী ও শিশু। দিনাজপুর থেকে হাজার হাজার নর-নারী রাধিকাপুর সীমান্ত দিয়ে পশ্চিম দিনাজপুরে প্রবেশ করছেন। রাধিকাপুর ও কালিয়াগঞ্জের মধ্যবর্তী খিয়ারিয়াতে দশ হাজারেরও বেশী লোক আশ্রয় নিয়েছেন। শরণার্থীদের আগমনে স্থানীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পর খুব চাপ পড়েছে।[৭]

বৈশাখী মেলায় আশার অপরাধে হত্যার পর টুকরো টুকরো করে

বগুড়ার সোনাতলা থানা থেকে জুমারবাড়ী যাওয়ার পথে ঘোড়াপীরের মেলা অবস্থিত। ১লা বৈশাখ উপলক্ষে মাসব্যাপী ঘোড়াপীরের মেলা বসেছিল। পাকিস্তানি সেনারা ঘোড়াপীর মেলায় গিয়ে এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ করে। পাকিস্তানি সেনাদের পথ দেখিয়ে মেলায় নিয়ে যায় স্থানীয় কিছু রাজাকার। এই দিন পাকিস্তানি সেনা ঘোড়াপীরের মেলায় কমপক্ষে ৩ জনকে হত্যা করে। শহিদের মধ্যে শুকরোকে পাকিস্তানি বাহিনি হত্যার পর টুকরো টুকরো করে ফেলে রেখে যায়।[৮]

বেয়নেটে ক্ষতবিক্ষত করে গুলি করে হত্যা করে

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার একটি গ্রাম রংপুর। রংপুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী একটি গ্রাম বসেরাবাদ, গ্রামটি ডুমুরিয়া উপজেলার অন্তর্ভুক্ত হলেও

ফুলতলা উপজেলা সীমানার ঠিক পাশে অবস্থিত। এপ্রিল মাসের প্রথম থেকে ফুলতলা উপজেলার কতিপয় দুর্বৃত্ত বসেরাবাদ গ্রামে এসে ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন করছিল। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে বন্দুক ও বোমার ভয় দেখিয়ে মূল হোতা লখাই ডাকাত সহ কিছু দুর্বৃত্তরা বসেরাবাদ গ্রামের কয়েকটি বাড়ি দখল করে নেয়। এলাকাবাসিরা তাদের গ্রামকে রক্ষা করার জন্য সংঘবদ্ধভাবে দুর্বৃত্তদের উপরে আক্রমণ করে। গ্রমবাসির গণ-পিটুনি দিয়ে ৪-৫ জন দুর্বৃত্তকে হত্যা করে। এই আক্রমণে রংপুর গ্রামের কিছু গ্রামবাসী সহযোগিতা করেছিল। লখাই ডাকাত ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর অন্যতম সহযোগী। গ্রামবাসীর গণ-পিটুনিতে তিনি নিহত হন।

পাকিস্তানি সহযোগীকে হত্যা করার প্রতিবাদে পহেলা বৈশাখ পাকিস্তানি সৈন্যরা দুটি গাড়িতে রংপুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী শলুয়া বাজারের কাছে এসে নামে। এরপর পাকিস্তানি সেনারা শলুয়া বাজারের উত্তর দিকের বিলের ভিতর দিয়ে পায়ে হেঁটে কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে রংপুর গ্রামে প্রবেশ করে। পাকিস্তানি সেনারা অলাদা আলাদা ভাবে গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি আক্রমণ করতে থাকে। একটি গ্রুপ গ্রামে প্রবেশের মুখে ভোলাল মণ্ডল নামে একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধীকে গুলি করে হত্যা করে।

অন্য একটি দল কালীবাটী ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রফুল্ল কুমার বিশ্বাসকে খোঁজ করতে থাকে। প্রফুল্ল কুমার বিশ্বাস ঐ দিন সকালে নিজ বাড়িতেই ছিলেন। পাকিস্তানি সেনাদের বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে তার পরিচয় দেন। তিনি ইংরেজি ভালো জানতেন বলে পাকিস্তানি সেনাদের বুঝানোর চেষ্টা করেন রংপুর গ্রামের মানুষ শান্তিপ্রিয় এবং শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গের এমন কোনো কাজে তারা নিযুক্ত নেই। কিন্তু পাকিস্তানি সেনারা তার কথায় কোনো কর্ণপাত না করে তাকে পার্শ্ববর্তী খালের পাশে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে।

ইন্দুভূষণ বিশ্বাস ও তার স্ত্রী উর্মিলা বিশ্বাস 'ভগবতী পূজা' করছিলেন। পাকিস্তানি সেনাদের প্রফুল্ল কুমার বিশ্বাসের বাড়ি আক্রমণ করতে দেখে পূজা ছেড়ে তাদের সন্তানদের নিয়ে ঘরের মধ্যে আশ্রয় নেন। প্রতিবেশি অনেকে তাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল।

প্রফুল্ল কুমার বিশ্বাসকে হত্যা করার পরে এই গ্রুপটি ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার ইন্দুভূষণ বিশ্বাসের বাড়িতে হামলা চালায়। পাকিস্তানি সেনারা ইন্দুভূষণ বিশ্বাসের ঘরের দরজা লাথি মেরে ভেঙ্গে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে। পাকিস্তানি সেনারা ঘরের দরজা ভাঙ্গার পূর্বেই ঘরের মধ্যে আশ্রয় নেওয়া মহিলা ও শিশুদের ঘরের পিছনের দরজা দিয়ে বাহিরে বের

করে দেয়। পাকিস্তানি সেনারা ঘরের মধ্য থেকে ইন্দুভূষণ বিশ্বাস ও তার স্ত্রী উর্মিলা বিশ্বাসসহ কয়েকজনকে ধরে পার্শ্ববর্তী জোদ্দার বাড়ি সংলগ্ন বিলে নিয়ে যায়।

পাকিস্তানি সেনাদের আর একটি দল জোদ্দার বাড়িতে আক্রমণ চালিয়ে ঐখান থেকে কয়েকজনকে আটক করে। অন্য গ্রুপ গ্রামের বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রামবাসীকে আটক করে জোদ্দার বাড়ির পাশে বিলে নিয়ে যায়। আটককৃতদের মধ্যে ১২ বছরের একটি ছেলেও ছিল। পাকিস্তানি সেনারা তাকে ছেড়ে দেয়।

পাকিস্তানি সেনারা বিলের পাশে আটককৃত আনুমানিক ৩০ জনকে বিলের পাশে মাঠের উপুড় করে শুইয়ে বেয়নেট চার্জ করে। বেয়নেটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে অনেকে আর্তনাদ করতে থাকেন, কেউ কেউ পালানোর চেষ্টা করেন। যারা পালানো চেষ্টা করেন তাদের পাকিস্তানি সেনারা গুলি করে হত্যা করে। ঘণ্টা খানেকের উপরে তাদের উপরে নির্যাতন চলতে থাকে।

নাহার বিশ্বাস ও রতন বিশ্বাস মোটর সাইকেলে করেশনুয়া বাজারের দিকে যাওয়ার সময় পাকিস্তানি বাহিনী তাদের ধরে রাইফেলের বাট দিয়ে অত্যাচার করে কাঁটাবনের মধ্যে ফেলে দেয়। গণহত্যা শেষে পাকিস্তানি বাহিনী ঐ দুই জনকে আহত অবস্থায় ক্যাম্পে নিয়ে যায়। তাদের সন্ধান আর পাওয়া যায়নি। রংপুর গণহত্যার শহিদের সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। কারণ, ঐদিন বহিরাগত অনেক গণহত্যার শিকার হয়েছিল।*

জবাই করে ফেলে দিতো

দিনাজপুর জেলার আব্দুলপুর ইউনিয়নে কাউগাঁ রেলস্টেশন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানি সেনাদের জন্য রেলস্টেশন গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কাউগাঁ রেলস্টেশনে পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্প ছিল। স্টেশন ঘিরে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকাররা অসংখ্য বাংকার গড়ে তুলেছিল। এখানে প্রায় ১০০ জন সৈন্য ও ৫০ জন রাজাকার অবস্থান করতো। এই স্টেশনের পশ্চিম পাশে এবং ব্রিজের পূর্বপাশে রেললাইনের ৩নং সিগন্যালের দক্ষিণ পাশে সে সময় জঙ্গলাকীর্ণ একটি নির্জন জায়গা ছিল। পাকিস্তানি সেনারা চিরিরবন্দরের বিভিন্ন জায়গা টহল দিয়ে লোকজনকে ধরে নিয়ে এসে গুলি ও জবাই করে এখানে ফেলে দিতো। বিভিন্ন জায়গায়গুলি করে হত্যা করে লাশগুলো ট্রেনের বগিতে করে এনে এই নির্জন জায়গায় ফেলে দিতো।

আব্দুলপুর ও অমরপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের ৩৪ জন লোককে কাজের

কথা বলে পাকিস্তানি সেনারা কাউগাঁ রেলস্টেশনের কাছে ধরে নিয়ে যায়। আত্রাই রেলব্রিজের পাশের এই নির্জন জায়গার একটি বাড়িতে বন্দি করে আগুনে পুড়িয়ে সবাইকে অমানবিকভাবে গণহত্যা করে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে, *একদিন পাকিস্তানি ও রাজাকার মিলে ভারত পলায়ন ১৫০ জন নারী ও পুরুষ শরণার্থীদের ধরে এনে ব্রাশফায়ার করে মেরে এই জায়গায় লাশগুলো একত্র করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। তখন আশপাশের গ্রামগুলোতে কোনো সাধারণ লোক ছিল না। প্রায় বাড়ি-ঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল।*[১০]

অফিসে পাওনা বিল আনতে গিয়ে..

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ দখলের পর ১ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল) পাকিস্তানি বাহিনী রেল সড়ক দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে অগ্রসর হবার পথে রেল লাইনের দুই পাশে বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এদিন বড়তল্লা গ্রামের উকিলপাড়ার হাছান আলীর ছেলে জুরালী ও তার ভাইয়ের ছেলে মনজুর আলীকে হত্যা করা হয়। চর-চারতলা গ্রামের উদীয়মান ব্যবসায়ী আবদুল মোতালেব ওরফে মালি কন্ট্রাক্টর ওয়াপদা অফিসে পাওনা বিল আনতে গেলে পাকিস্তানি বাহিনী তাকে আশুগঞ্জ ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। অপরদিকে ভৈরবের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাফিজউদ্দিন মিয়া ও মনতু মিয়াকে পাকিস্তানি সেনারা আশুগঞ্জে ধরে নিয়ে আসে। এই তিন জনকে মেঘনা নদীর রেলওয়ে ব্রিজের ওপর দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। আড়াইসিধা গ্রামের আবদুল গনি চট্টগ্রামে চাকরি করতেন। পাকিস্তানি বাহিনী সেখানেই তাকে হত্যা করেছে। একই গ্রামের সুরুজ মিয়া গণহত্যার শিকার হয়েছেন।[১১]

হত্যার পর সমস্ত লাশ গুলো ডোবার মধ্যে ফেলে দেয়

পাকিস্তানি সেনারা লালমাটিয়া জেলা সদরের সাহেবপাড়ায় আক্রমণ করে। শহিদ সন্তান ও রেলওয়ের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী আশরাফ আলী জানান, *মুক্তিযুদ্ধকালে আমি ১২ বছরের কিশোর ছিলাম। সাহেবপাড়ায় বসবাস করতাম। ১৯৭১ সালের ১ বৈশাখ (১৫ এপ্রিল) সন্ধ্যায় পাকিস্তানি সেনা বাহিনীর মেজর সমুন্দর খান, বিহারিদের নেতা কালুয়া গুন্ডা, রাজাকার আব্দুর রশিদ, নিজামউদ্দিন নাপিত, ফরিদ, গণি, নিজাম প্রমুখ আমাদের বাড়িতে হামলা চালায় এবং পিতা মোঃ মন্ডল, মা ছালেয়া খাতুন, ভাই আলতাব হোসেন, বোন বেনু, বোন শেলী, বোন হাসনা, ভাই এমদাদুল, চাচী মর্জিনা বেগম, চাচাত ভাই হেলাল ও বেলাল, চাচাত বোন নাসিমা বেগম সহ পরিবারের ৯জনকে গুলি করে। পাশের বাড়ির বিনয় কুমার দাশ*

ও মিনতি কুমার দাশকেও তারা হত্যা করে।

সাহেবপাড়ায় ১২জনকে হত্যার পর সমস্ত লাশ একটি ডোবার মধ্যে ফেলে দেয়।[১২] ১২ জনের মধ্যে ৬ জন শিশু ছিল। যাদের বয়স ৪-১০ এর মধ্যে ছিল। সাহেবপাড়ার আরো অনেককে অনেককে ধরে নিয়ে গিয়ে ৫ এপ্রিল গণহত্যা করা হয় ট্রলিল্যান্ড, ইমামবাড়াসহ বিভিন্ন স্থানে।

চা বাগানের শ্রমিরাও রক্ষা পায়নি

মৌলভীবাজার জেলার গিয়াসনগর ইউনিয়নের একটি চা বাগান 'মৌলভী চা বাগান'। পাকিস্তানি বাহিনী এই বাগানে প্রবেশ করে ৩০ জনের অধিক চা শ্রমিককে হত্যা করে। এদের মধ্যে কয়েকজনের নাম মৌলভী চা বাগান স্মৃতিফলক পাওয়া যায়–রামেশ্বরী বাগতি, গণেশ সাধু ও লছমীনারায়ণ পাশী। মৌলভী চা বাগানে পাকিস্তানি বাহিনীর কোনো ক্যাম্প ছিল না। এই ঘটনার পরপরই বাগান ছেড়ে অনেকে ভারতের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। শহিদ রামেশ্বর বাগতি ও গণেশ সাধুর স্মরণে বাগানের প্রবেশ মুখে একটি শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে।[১৩]

বেছে বেছে হিন্দুদের হত্যা করে

১ বৈশাখ মাসের ২-৩ তারিখে (১৫-১৬ এপ্রিল) পাকিস্তানি সেনারা নারায়াণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানায় ৭ জন হিন্দু লোককে হত্যা করে। প্রভাকরদির দুজন রাজাকার গোলাম মোস্তফা ও ফারুক পাকিস্তানি সেনাদের আড়াইহাজার থানার খবরা খবর দিতো। মুক্তিযোদ্ধারা এটা জানতে পেরে গোলাম মোস্তফাকে থ্রি নট থ্রি রাইফেল, আশি রাউন্ড গুলি ও ৪টি গ্রেনেডসহ গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেন।[১৪]

২

বৈশাখ মাসের ২য় দিন ১৩৭৮। দিনটি ছিল শুক্রবার এবং ইংরেজী মাসের ১৬ এপ্রিল ১৯৭১। পাকিস্তানি সেনারা এই দিনে বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় বোমা হামলা চালায়। শুধু বোমা হামলাই নয় রাজাকার ও বিহারিদের সহযোগীতায় বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ করে কয়েক হাজার সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। এই দিনে পাকিস্তানি সেনারা চুয়াডাঙ্গায় জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করে। আহত অবস্থায় হাসপিটালে গেলেও রক্ষা পায়নি।

নাপাম বোমায় ক্ষতবিক্ষত হয় চুয়াডাঙ্গা, দুই-তিন দিন সেই আগুন জ্বলে

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে চুয়াডাঙ্গা শহর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। পাকিস্তানি বাহিনী চুয়াডাঙ্গা শহর তাদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য ৩ এপ্রিল প্রথম বিমান হামলা চালায়। সেই দিন বিমান হামলায় পাকিস্তানি সেনারা বিমান থেকে গুলি ছোড়ার পাশাপাশি নাপাম বোমা নিক্ষেপ করে। বিমান হামলায় বেশ কিছু ঘরবাড়ি ধ্বংস এবং অনেক মানুষ মারাত্মকভাবে আহত এবং মারা যান।

ফরাসি টেলিভিশন কর্পোরেশনের সদস্যরা ৩ এপ্রিল চুয়াডাঙ্গায় নাপাম বোমা হামলার সেই চিত্র ধারণ করলে বিশ্ববাসী সর্বপ্রথম বাংলাদেশের যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতা সম্পর্কে জানতে পারেন।

ফরাসি চ্যানেল-১ এর সাংবাদিক ফিলিপ আলফস ১৯৭১ সালের ৩ এপ্রিল নাপাম বোমা হামলা নিয়ে টিভি নিউজে ৫জন শহিদের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে পরবর্তীতে আহত কয়েকজনের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায়।

১৬ এপ্রিল শুক্রবার সকাল ৯ টা ও বেলা ১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি বাহিনী নাপাম বোমা হামলা চালায়। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১, যুগান্তর পত্রিকায় ১৬ এপ্রিল নাপাম বোমা হামলায় চুয়াডাঙ্গায় ৫০ জনের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেন।

একাত্তরে বড়বাজারের পাশে পুরাতন জেলা পরিষদের ডাকবাংলো ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের হেডকোয়ার্টার। পাকিস্তানি বিমান ঐ ভবনের উদ্দেশ্যে নাপাম বোমা নিক্ষেপ করলে তা গিয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী বড়বাজারের মধ্যে। সেদিন ছিল বড়বাজার সাপ্তাহিক হাটবার। নাপাম বোমা হামলায় শহিদদের সংখ্যা ও তাদের নাম পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। তবে ২০-৩০ জন শহিদ হয়েছিল বলে জানা যায়।

চুয়াডাঙ্গা শহরের ইপিআর ক্যাম্প ধ্বংস করার জন্য ২ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল) শুক্রবার পাকিস্তানি বাহিনী বিমান দিয়ে নাপাম বোমা নিক্ষেপ করে। সেই সময় ইপিআর ক্যাম্পে বেশ কিছু তেল ভর্তি ড্রাম রাখা ছিল। তাতে আগুন ধরে যায়। প্রায় দুই-তিন দিন সেই আগুন জ্বলে। আগুনে পুড়ে এবং বিমান হামলায় অনেক ইপিআর সদস্য শহিদ হন। তবে সেই দিনের ঐ আক্রমণে কতো জন শহিদ হয়েছিলো সেই সম্পর্কে জানা যায়নি।

বাঁচার জন্য ডোবার মধ্যে আত্মগোপণ করলেও রক্ষা পায়নি

দুপুর আনুমানিক ২-২.৩০টার দিকে পাকিস্তানি সেনাদের স্থল বাহিনীর একটি দল চুয়াডাঙ্গার সরোজগঞ্জ বাজারের মানুষের ওপর ব্যাপক গুলিবর্ষণ

করতে শুরু করে। ঐদিন (শুক্রবার) সাপ্তাহিক হাটবার হওয়ায় আশপাশের অনেক গ্রাম থেকে মানুষ বাজারে আসে। এই বাজারেই পাকিস্তানি বাহিনী বর্বরোচিত গণহত্যা চালায়। তারা বাজারের লোকজনকে ধরে ধরে পাশের পুকুরের ধারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করায় এবং নির্মম নির্যাতনের পর একে একে নিষ্ঠুরভাবে গুলি করে হত্যা করে।

পাকিস্তানি বাহিনী রাস্তা থেকেই যে এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ করে, তাতে বাজারের লোকজন প্রাণভয়ে এদিক ওদিক দৌড় দিয়েও রক্ষা পায়নি। সেদিন পাকিস্তানি বাহিনী গুলিবর্ষণ ছাড়াও বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে ও লাঠিচার্জ করেও অনেককে নির্মমভাবে হত্যা করে। পাকিস্তানি সেনাদের আসতে দেখে অসংখ্য মানুষ বাজারের পাশে কচুরিপানা পূর্ণ পুকুরের মধ্যে আত্মগোপণ করার চেষ্টা করেন। পাকিস্তানি সেনারা পুকুরের মধ্যে এলোপাথাড়ি গুলি করে পুকুরের মধ্যে আত্মগোপণ করে থাকা মানুষদের হত্যা করে।

ঐদিন সরোজগঞ্জ বাজারে গণহত্যায় ঠিক কতজন লোক শহিদ হন তা সঠিক জানা যায়নি। কেউ বলেন আনুমানিক ৭০/৮০ জন আবার কেউ জানান প্রায় ১০০ জন লোক ঐদিন বাজারে নিহত হন। নবীননগর গ্রামের ৭ জন শহিদসহ আশপাশের গ্রাম মিলে মোট ২৫ জন নিহত এবং ৯ জন আহত ব্যক্তির পরিচয় জানা সম্ভব হলেও বাকিদের চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। পাকিস্তানি সেনারা সরোজগঞ্জ বাজার এবং সরোজগঞ্জ বাজারের পাশে পুকুর ২টি স্থানে ঐদিন গণহত্যা চালায়।

জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করে

সরোজগঞ্জ বাজারে আক্রমণ করে চুয়াডাঙ্গা শহরে প্রবেশের সময় ডিঙ্গেদহ বাজারে বাবলা গাছের নিজে দুইজন সহ ছুটাছুটি অবস্থায় ২৫ থেকে ৩০ জন মানুষকে গুলি করে হত্যা করে।

ডিঙ্গেদহ বাজার থেকে হাফ কি.মি. দূরে বর্তমান হাইওয়ে ফিলিং স্টেশনের পাশে ৫-৬ জন ধান ভাঙ্গার কলে ধান মাড়াই ছিলেন। ৩ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল) পাকিস্তানি বাহিনী সরোজগঞ্জ বাজারে শতাধিক মানুষকে হত্যা করে ডিঙ্গেদাহ হয়ে চুয়াডাঙ্গা শহরের যাচ্ছিল। পাকিস্তানি সেনাদের আসতে দেখে ঐ ৫-৬ জন লোক ধান ভাঙ্গা বন্ধ করে জীবন বাঁচানোর জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের খোরা বাঙ্কারের মধ্যে প্রবেশ করেন। পাকিস্তানি সেনারা দূর থেকে সেটি দেখে মনে করেন মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ করার জন্য বাঙ্কারের মধ্যে অবস্থান নিচ্ছেন। পাকিস্তানি সেনারা বাঙ্কারের সামনে এসে খড় দিয়ে

বাঙ্কারের মুখ বন্ধ করে দিয়ে তার ওপর পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে সবাইকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে।

আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হলেও রক্ষা পায়নি

৩ বৈশাখ (১৬ই এপ্রিল) নাটোর সদর হাসপাতালের কর্মচারী জীবনকৃষ্ণ মানিকে হত্যা করে পাকিস্তানি বাহিনী। স্থানীয় আঁকি চৌধুরী, জীবন কৃষ্ণর বাড়িওয়ালা মধু মিয়া ও দুদু মিয়া তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিল যে- *চিকিৎসার সাথে যুক্তদের কোন ক্ষতি হবে না।*

ফলে কোথাও যাননি তিনি। এক পর্যায়ে তাঁর বাড়ি আক্রমণ করে তাঁর উপর অত্যাচার, নির্যাতন করা শুরু করে হানাদাররা। মারাত্মক আহত অবস্থায় তিনি ভর্তি হন সদর হাসপাতালে। সেখানে তাকে পুরুষ ওয়ার্ডের পিছনের দিকে একটি রুমে লুকিয়ে চিকিৎসার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু দালালরা টের পেয়ে যায়। তারা সেখানে আক্রমণ করে এবং জীবন কৃষ্ণকে পরপর ৩ রাউন্ড গুলি করে হত্যা করে।[১৮]

সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে

মৌলভীবাজারের রাজনগর সদর ইউনিয়নের মজিদপুর গ্রামে ছিল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ওয়াহিদুর রহমানের বাড়ি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিনি দিনাজপুর সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর ভাই ফয়জুর রহমান চৌধুরী ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার। তিনি চাকরি করতেন গাজীপুর সমরাস্ত্র কারখানায়। পাকিস্তানি শত্রুরা ৬ এপ্রিল তাঁকেও নির্মমভাবে হত্যা করে।

২ বৈশাখ (১৬ই এপ্রিল) হানাদার বাহিনী এই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ওয়াহিদুর রহমানকে সপরিবারে তাঁর বাসভবনে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই গ্রামের ডাক্তার যামিনী কুমার দেবকে হানাদার বাহিনী ধরে এনে মৌলভীবাজার পাকিস্তানি ক্যাম্পে হত্যা করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে এই গ্রামের ১০-১৫ জন পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে শহিদ হন।[১৯]

নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালিদের রাজাকারের সহযোগীতায় হত্যা করে

বেলা অনুমান ১১ টা থেকে সাড়ে ১১ টার সময় মতিউর রহমান নিজামীর সহযোগীতায় তার পক্ষের অনুসারীরা পাকিস্তানী আর্মির সহায়তায় পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার আড়পাড়া গ্রামে একযোগে আক্রমণ করে গ্রামের নিরীহ নিরস্ত্র হাফেজ ওমর আলীসহ ১৯ জনকে গুলি করে হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করে এবং তাদের বাড়িঘর লুট করে আগুন ধরিয়ে দেয়।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও রাজাকারদের মিলিত দল পাতিলাখালী গ্রামের আয়েস ফকির, পিতা- জুব্বার ফকির, রিজুসরদার, পিতা-সবরাজ, নারিচা, গ্রামের কুলসুম বেওয়াসহ উক্ত এলাকার আরও অনেক লোককে গুলি করে হত্যা করে। এবং তাদের বাড়িঘর লুট করে আগুন ধরিয়ে দেয়। এদিনের গণহত্যায় পরোক্ষভাবে সহোযগীতা করেছিলেন কুখ্যাত ঘাতক মতিউর রহমান নিজামী।

রাজাকার প্রধান মতিউর রহমান নিজামীর সহযোগীতায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার ভূতের গাড়ি গ্রামে আক্রমণ করে। প্রায় ১০ নিরিহ বাঙালিকে গুলি করে হত্যা করে। দূর্ভাগ্যবশত শহিদদের সকল আত্মীয়স্বজন পরবর্তীতে ভারতে চলে যাওয়ায় কোন পরিচয় জানা যায়নি।[১৭]

পুনঃদখল করে হত্যায় মেতে উঠে

২ বৈশাখ (১৬ এপ্রিল) পাকিস্তানি বাহিনী কুষ্টিয়া পুনঃদখলের পর বাহাদুর বিশ্বাস লেনের বিভিন্ন স্থানে তিন জন এবং কফিলুদ্দিন প্রামাণিকের পরিবারের পাঁচজন সহ মোট ৮-১০জনের অধিক মানুষকে হত্যা করে। অ্যাড. আব্দুল জলিল ৬ এপ্রিলের '*মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ*' প্রবন্ধে মুক্তিযুদ্ধে কুষ্টিয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

'অনুমান বিকাল ৫/৬ টার দিকে পাকিস্তানি বাহিনী জেড়ামারার ব্রিজ পার হয়ে জিকে ক্যানাল ধারের ঘর বাড়ি পোড়াতে পোড়াতে শহরের দিকে আসতে থাকে। তখন হাজী বরকত, সুজাত, মুসা, মতিসহ কয়েকজন আমলার ওয়াপদা জিপ গাড়ি নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থান দেখার জন্য গিয়ে আর ফিরে আসে না। তখন আমি, রাজ্জাক, আনিস, ফজর ডাকবাংলা অফিস বন্ধ করে পাক পিকচার সিনেমা হল পর্যন্ত যেতেই দেখি ট্রাফিক মোড়ে রউফ চৌধুরীর বাড়িতে আগুন এবং গুলির শব্দ শুনি। আমরা পালানোর চেষ্টা করি। এই সময় সঙ্গে থাকা আনিস মোয়াজ্জেম স্টোরের আগে গুলিবিদ্ধ হয়। মারফত আহত অবস্থায় তাকে নিয়ে বাড়ির মধ্যে যায়। রশিদ ও জিল্লুর সঙ্গে দেখা হলে জিল্লুর বাড়িতে রেখে মোল্লা তেঘরিয়াতে নিয়ে যায়।

পরে গড়াই নদীর ওপারে বানিয়াপাড়ায় যায়, তারপর দিন আমি ভাগ্নে রাজ্জাককে নিয়ে কাচেরখোল হয়ে মামুনের বাড়ি যাই। সেখানে থাকা সম্ভব না হওয়ায় রাত্রে আলমডাঙ্গার ঘোষবিলা জালাল মাস্টারের বাড়িতে যাই। তারপর দিন উত্তম নামের এক ছেলের সাথে আমরা ভারতে যাই।'[১৮]

৩

৩ বৈশাখ ১৩৭৮। দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল শনিবার। পাকিস্তানি সেনারা অন্যান্য দিনের মতোই আজকের এই দিনে বাংলাদেশের

বিভিন্ন স্থানে গণহত্যা-নির্যাতন চালায়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী একাত্তরের আজকের এই দিনে পাকিস্তানি সেনারা ৬টি জেলার ৭টি স্থানে ব্যাপক আক্রমণ করে নয় শতের বেশি মানুষকে হত্যা করে। তবে প্রতিটি জেলায় থাকা নির্যাতন কেন্দ্র ও বধ্যভূমিতে কত মানুষ হত্যা করেছে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য নেই। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে দু-একজন করে আজকের দিনে অনেক বাঙালিকে হত্যা করেছিল পাকিস্তানি সেনারা। অগ্নিসংযোগ করে শত শত বাড়িতে। শত শত মানুষ প্রাণ ভয়ে ভারতে গমন করে।

মৃত্যুর যন্ত্রণাকে আরো যন্ত্রণাদায়ক করতে, বেয়নেট দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের এদেশীয় দালালদের পরামর্শে নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার রামকান্তপুর আক্রমণ করে। রাতের অন্ধকারে তারা নিরীহ মানুষদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন করে। মূলত বিহারি আব্দুল মজিদ, ওয়ালিয়ার এলাহী ডাক্তার, মোহরকয়ার তসিকুল ইসলাম প্রমুখ রাজাকার ও শান্তি কমিটির সদস্যদের নেতৃত্বে পাকিস্তানি বাহিনী এসেছিল। তারা পাকিস্তানি বাহিনীকে বলেছিল এ গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সহযোগীরা রয়েছে।

পাকিস্তানি বাহিনী সেই কথায় বিশ্বাস করে ঈশ্বরদি বিমানবন্দর থেকে লালপুর থানার রামকান্তপুরে এসেছিল। রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করায় অনেকেই যারা বাড়িতেই ঘুমিয়েছিল। তারা পালাতে পারেনি। ঘুমন্ত অবস্থায় বাড়ি থেকে তুলে আনে আমবাগানে এবং সেখানেই তাঁদের হত্যা করে। তাঁদের পরনের কাপড় খুলে সেই কাপড় দিয়েই বেঁধে রাখে। এরপর নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে।

গুলি করেই শেষ হয়নি দুর্বৃত্তদের অত্যাচার। আবুল হোসেন, দুখু মিয়া, তইজ উদ্দিন প্রমুখ আহত অবস্থায় কাঁতরাচ্ছিলেন। ফলে তাঁদের উপর পুনরায় বেয়নেট চার্জ করা হয়। সেদিন রাতে রামকান্তপুরের প্রায় ৩৫-৪০ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছিল পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা।[১৯]

পিতাকে ছেড়ে দিতে বললে ঘাতকরা বাবাকে সাথে সাথে গুলি করে হত্যা করে

ওয়াজেদ ডাক্তারের ছেলে তারার (গুরুদাসপুর) সহযোগীতায় আব্দুল জলিল, চাঁচকৈড় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম মোল্লা, ইয়ার উদ্দিন, মোতাজ বিহারি প্রমুখর পরামর্শে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নাটোর

জেলার গুরুদাসপুরের উত্তর নারিবাড়ী আক্রমণ করে। এই এলাকাটি হিন্দু অধ্যুষিত ছিল বহু পূর্ব থেকেই এবং ব্যবসা বাণিজ্যেও তাঁরা ভূমিকা রাখত। পাকিস্তানি সেনারা প্রথমেই মনীন্দ্রনাথকে ধরে ফেলে। তাঁর ছেলে নীল রতন সরকার প্রতিবেশী নবরাম, কালাম, গোপীনাথ, দীলিপ কুমার সহ নিয়ে তাস খেলছিলেন। পিতাকে ছেড়ে দিতে বললে ঘাতকরা নীলরতন ও তাঁর বাবাকে সাথে সাথে গুলি করে হত্যা করে। তাঁদের হত্যার পর বাহির ঘরে থাকা নবরাম, দীলিপসহ আরও কয়েকজন পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তখন হানাদাররা গুলি ছুঁড়লে নবরাম ও দীলিপ ঘটনাস্থলেই মারা যান।
পাশের বাড়ি গুলো থেকে একে একে শীতানাথ, বলরাম, সুরেশ চন্দ্র মালাকার, তাঁর পুত্র মানিক মালাকার, দই ব্যবসায়ী বিষ্ণুপদ ঘোষ, যদুনাথ কর্মকার, দুখুরাম, দুলাল, গেদু, বাদলসহ আরও কয়েকজনকে ধরে নিয়ে আসে। প্রায় ১৪-১৭ জনকে এক লাইনে দাড় করে হত্যা করা হয়। বাজার থেকে ফিরবার পথে সুবোধ চন্দ্রকেও গুলি করে হত্যা করা হয়। এসময় উষারানী নামক একজন মহিলাকে হানাদার বাহিনীর কয়েকজন সদস্য ধর্ষণ করে ফেলে রেখে যায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায়।[২০]

না আছে খাবার মতো ঘরে কিছু! না আছে ঘর!!

এপ্রিলের ১৭, ১৯৭১। বেলা বারোটার দিকে গ্রামের দক্ষিণ দিক থেকে ছিদ্দিক মোড়ল সংবাদ দিলেন পাকিস্তানি বাহিনি গানবোটে করে পালেরহাটে নেমে খুলনার আজগড়া গ্রামে প্রবেশ করছে। সাথে আছে স্থানীয় রাজাকার জুম্মান খান। পাকিস্তানি বাহিনি প্রথমে আজগড়ার রথখোলা মন্দিরে উপস্থিত হয়। মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর করে তছনছ করে ফেলে। এরপরে মন্দিরে রক্ষিত রথসহ পুরো মন্দিরটি আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। মন্দিরের পাশে দাঁড়ানো ছিলো ৬০ বছর বয়সী পল্লী চিকিৎসক কালীদাস চক্রবর্তী। তিনি অনেকটা বধির ছিলেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনি তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি নীরব থাকেন। তখন পাকিস্তানি বাহিনি এই বৃদ্ধ লোকটিকে গুলি করে। সেখানেই মারা যান কালীদাস চক্রবর্তী।

এ খবর গ্রামে পৌছালে পাশের বাড়ি থেকে এগিয়ে আসেন ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল। প্রায় ৭০ বছর বয়সী এই মানুষটি ছিলেন একজন শিক্ষক। উর্দু ভাষা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিলো। তিনি এগিয়ে গেলেন তাদের বুঝাতে যে এখানে কেউ আওয়ামী লীগ করে না। বাড়ির বাকি সদস্যদের তিনি বাড়িতে থাকতে বলেন। তাঁর কোন কিছু বলার আগে তাকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলে পাকিস্তানি বাহিনি। এ ঘটনার পরে বিপদ বুঝতে আর কারো

বাকী থাকল না। বাড়ির নারী পুরুষ শিশু সবাই বাড়ি ছেড়ে গ্রামের পশ্চিম দিকে ছুটতে থাকে। এরপর পাকিস্তানি বাহিনি বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়। তার আগে চলে লুটপাট। গ্রামের বেশিরভাগ ঘরবাড়ির ছাউনি ছিলো খড়কুটো দিয়ে। কাজেই বৈশাখের প্রচন্ড তাপে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে আজগড়া।

এরপরে পাকিস্তানি বাহিনির একটি দল উপস্থিত হয় আজগড়ার হীরালাল গোস্বামীর বাড়িতে। ৭০ বছর বয়সী হীরালাল এবং তার স্ত্রী ভাবতেই পারেনি যে এই বয়সে পাকিস্তানি সেনাবাহিনি তাদের মারতে পারে। এই বিশ্বাসে বাড়ির অন্য সদস্যরা বাড়ি ছেড়ে পালালেও তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়িতে থেকে যান। আরো সাথে ছিল ৮-৯ বছর বয়সী পৌত্র বিশ্বনাথ গোস্বামী। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনি তার বাড়িতে ঢুকে তাকেও গুলি করতে উদ্যত হয়। তখন তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে তার স্ত্রী এবং তার প্রাণভিক্ষা চেয়েছিলেন। পাকিস্তানি বাহিনি তার স্ত্রী এবং তাকে বললো- ভাগ যা। এই কৃতজ্ঞতার প্রতিদান হিসেবে বৃদ্ধ হীরালাল পাকিস্তানি বাহিনির মুখো হয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে তাদের প্রণাম করতে গিয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি মিলিটারিরা তাকে গুলি করে, মাটিতে সেভাবেই উপুড় হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন হীরালাল। দূর থেকে স্বামীর এই করুণ পরিণতি চেয়ে চেয়ে দেখলেন তার স্ত্রী, হাতে ধরা ছিলো তার নাবালক পৌত্র বিশ্বনাথ গোস্বামী। দাদুর এই পরিণতি তাকে ভীষণ অসহায় ও ভীতসন্ত্রস্ত করে তুললো। বৃদ্ধ হীরালালের স্ত্রী স্বামীর লাশ ফেলে পৌত্রের কথা চিন্তা করে তাকে হাতে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ছেড়ে চলে যান। এরপর পাকিস্তানি বাহিনী তার বাড়িটি আগুন লাগিয়ে দিলো।

পাকিস্তানি বাহিনী এবং এদেশে তাদের দোসররা গ্রাম থেকে চলে যাওয়ার পরে নিরীহ এই লোকগুলি যখন আবার বাড়ি ফিরে আসলো, তখন তারা এক বেদনাভরা ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে পায়, যা তাদের বাঁচার আশাটুকুও বিলীন করে দেয়। একদিকে যেখানে সেখানে পড়ে আছে প্রিয়জনের গুলিবিদ্ধ খণ্ড বিখণ্ড মৃতদেহ। কারো হাত উড়ে গেছে তো কারো ফুসফুস বেরিয়ে গেছে, বীভৎস সব মৃতদেহ। অন্যদিকে যে কাপড়টা পরে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিলো বাড়ি এসে দেখে সম্বল বলতে ঐ টুকুই আছে। না পারছে কাপড়টা পরিবর্তন করতে, না আছে খাবার মতো ঘরে কিছু, না আছে ঘর। সবাই দিশেহারা। প্রিয়জনের লাশগুলো সৎকার করার মতো শক্তিটুকুও বেঁচে যাওয়া মানুষগুলোর ছিলো না। কোলের অবুঝ শিশুটিও ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর। তার মুখে কিছু দিবে এমন কিছু অবশিষ্ট নেই। এ সময়ে মানবিক টানে কাছে এগিয়ে আসলেন কিছু মুসলিম সম্প্রদায়ের

লোক, তারাই মৃতদেহগুলো কোন রকমে কয়েকটা গর্ত খুঁড়ে পুঁতে রাখে। তারা সর্বস্বহারা লোকগুলোর জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করলেন, ব্যবস্থা করলেন কিছু আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্র।

অনেকে চলে যায় ভারতে, অনেকে ভিটে মাটির মায়ায় এবং ভালো মনের কিছু মুসলিম ভাইদের আশ্বাসে থেকে যায় নিজের ভিটেয়। কিন্তু আশ্বাস বা মায়ায় যারা ছিলো তারা শান্তিতে থাকতে পারেনি। স্থাবর অস্থাবর সম্পদ থেকে শুরু করে নারী- যা রাজাকার এবং পাকিস্তানি মিলিটারিদের প্রয়োজন, তা তাদের দিতে হতো। নারীর ক্ষেত্রে সাধারণত বাইরের গ্রাম থেকে আসা মেয়েগুলোকে তারা নিশানা করতো। খুলনা শহরের অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের যুবতী নারী এবং মেয়েদের এই গ্রামে রেখে গিয়েছিলো। এরাই ছিলো পাকিস্তানি দোসরদের নিশানা। সেদিনের সেই ভয়ালচিত্র আজও আজগড়াবাসী ভোলেনি।[২১]

জীবন দিয়ে দেশকে রক্ষা

রাত ৮ টায় পাকিস্তানি বাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শাহবাজপুর এলাকায় মুক্তিবাহিনীর ওপর আক্রমণ করে। মুক্তিবাহিনীও তিতাস নদীর অপর পাড় থেকে পাল্টা আক্রমণ চালায়। সারা রাত যুদ্ধ হয়। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনীর ভারী অস্ত্রশস্ত্রের বিপরীতে টিকতে না পেরে ভোর রাতের মধ্যে মুক্তিবাহিনী পিছু হটে গিয়ে মাধবপুর এলাকায় অবস্থান নেয়। এদিনের যুদ্ধে শাহবাজপুর গ্রামের রনু নাগ (সাতঘরিয়া হাটি), চান্দালী মিয়া ও চান মিয়া (হাবলীপাড়া) শহিদ হন।[২২]

নির্মম নির্যাতন করে হত্যা

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ৩ বৈশাখ (১৭ এপ্রিল) নির্মম নির্যাতন করে কুষ্টিয়া শহরের অসংখ্য সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। শহিদের মধ্যে যাদের নাম পাওয়া সম্ভব হয়েছে-কুষ্টিয়া শহরের পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কাশেম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ইন্তাজ আলী এবং তার পুত্রকে। আনছার আলী, ঠিকাদার হাসান ফয়েজ, পিয়ার টেক্সটাইলের মালিক শামসুদ্দিন আহম্মদ, তার ভগ্নিপতি এবং তার মাতাকে পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করে। ব্যবসায়ী রফিক আহমদ, হাজী ফকির আহমদ, আব্দুল গণী উকিল, ফুটবলার সোহরাওয়ার্দী, শামসুল হুদা বুড়ো, ওবাইদুর রহিম বুলু, কমলাপুরের নবীন প্রামাণিক ও তার দুই পুত্র, টিকেপাড়ার আতিয়ার রহমান, অড়য়াপাড়ার সবুর, আতিয়ার, শাজাহান, আলতাফ আলী,

আফতাব উদ্দিন, আবদুল গণি, রমজান আলী মণ্ডল ও তার দুই পুত্র আলতাফ ও মাফোজ্জেল, দীন মহম্মদের পুত্র আবদুল প্রমুখ সাধারণ মানুষকে নির্মমভাবে নির্যাতন করে হত্যা করে পাকিস্তানি সেনারা।[২৩]

সবুজ ভূমি হাজারো বাঙালির রক্তে লাল হয়ে যায়

১৭ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী সেদিন বদরগঞ্জ রেলস্টেশনের পশ্চিমে ১ কিলোমিটার দূরে বৈরাগীর ঘুমটির কাছ থেকে দক্ষিণে বুজরুক হাজীপুর পর্যন্ত ঘিরে ফেলে। অপরদিকে খোলাহাটি স্টেশনের পূর্বদিকে ট্যাক্সের হাটের ঘুমটির কাছে দক্ষিণে করতোয়া নদীর গা ঘেঁষে বকশীগঞ্জ স্কুল পর্যন্ত অর্ধবৃত্তাকারে ঘেড়াও করে বুজরুক হাজীপুর, খালিশা হাজিপুর, ঘাটাবিল, রামকৃষ্ণপুর, বছাশবাড়ি, বানিয়াপাড়া, খোর্দ্দবাগবাড়, মাসানডোবা সহ অন্যান্য গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। একই সাথে চালায় তারা গণহত্যা।

৫ বছরের শিশু থেকে শুরু করে অলতিপর মানুষও রেহাই পায়নি। সে দিন গণহত্যার নেতৃত্ব দেয় পার্বতীপুরের বাচ্চু খান এবং কামরুজ্জামান। বেলা ২ টা থেকে রামনাথপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ ধরে আনে ঝাড়ুয়ার বিল এবং পদ্মপুকুর এলাকায়। সেখানে গুলি করে হত্যা করে দেড় সহস্রাধিক মানুষকে। বেলা ২টা থেকে সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত চলে এ হত্যাকাণ্ড। এই গণহত্যায় প্রায় ৪০০ মানুষ শহিদ হয়।[২৪]

জঙ্গি বিমান বহর থেকে বোমাবর্ষণে ক্ষতবিক্ষত

সিলেটের খরিসের সেতুর বাম পাশেই হেমু গ্রাম। এই গ্রামের ভেতর দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী সেতুতে উঠেছিল। পাকিস্তানি জঙ্গিবিমান বহর ১৭ এপ্রিল এই গ্রামের ওপর বোমাবর্ষণ করে। বোমা হামলায় শহিদ হয় অনেক বাঙালি। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে হত্যা করে ১২ জনকে।

হরিপুর সেতুর কাছে পাকিস্তানি বাহিনীর বুলেটে শহিদ হন হাবিলদার গোলাম রসুল, আবদুল মালেক ও আবদুল রব। চিকনাগুল তহসিল অফিসের কাছেই তাদের গণকবর দেওয়া হয়।[২৫]

বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে

৩ বৈশাখ (১৭ এপ্রিল) পাকিস্তানি বাহিনী গাজীপুরের টঙ্গীর জিরো পয়েন্টে আরিচপুর গ্রামের ঘরে ঘরে তল্লাশি চালিয়ে অন্তত ৩০০ জন বাঙালিকে হত্যা করে। সেদিন কাকতালীয়ভাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি রেলগাড়ী লাইনচ্যুত হলে পাকিস্তানিরা এরজন্য মুক্তিযোদ্ধাদের দায়ী করে।

তাদের হেড কোয়ার্টার ছিল টঙ্গী টেলিফোন শিল্প সংস্থা। এটি ছিল গণহত্যা ও নির্যাতনের প্রধান কেন্দ্র। টঙ্গী টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টিআইসি) ক্যাম্প হতে হঠাৎ করে শত শত পাকিস্তানি সেনাদল টঙ্গীর আরিচপুর ও আশেপাশের এলাকায় প্রবেশ করে শুরু করে অগ্নিসংযোগ, গণহত্যা ও নির্যাতন। ভয়ে আতঙ্কে অনেক মানুষ টঙ্গীর ঢাকা-টঙ্গী ব্রিজের নিচে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের ধরে হত্যা করেছে পাকিস্তানিরা।

ঘনবসতিপূর্ণ আরিচপুরের পুরো এলাকা তছনছ করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে হত্যাযজ্ঞ চালাতে শুরু করে। কোথাও ২ জন, ৩ জন, ৫ জন, ১০, ২০ জন করে ২৫ থেকে ৩০টি স্থানে শত শত নিরীহ মানুষকে তারা গুলি করে, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। শিল্প অধ্যুষিত টঙ্গী এলাকা হওয়ায় বাইরের বহুলোক এ অঞ্চলে বাস করতো।

গণহত্যা শহিদ শত শত মানুষের মধ্যে স্থানীয়দের অল্পকিছু নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে– তাঁরা হলেন জৈমত আলী, কিয়ামুদ্দিন মাস্টার, হাবিবুল্লাহ, আদম আলী, সাত্তার, কাসেমের বাবা, কাদির সরকার, শাহজাহান গাজী, মুন্নাফ (গফুরের ভাই), তালেব আলী, ওবায়দুল হক, আজমত উল্লাহ, দুদু মিয়া, ওমর আলী, নিয়ত আলী, আব্দুল মান্নান, আ. সাত্তার, সরওয়ার, সরওয়ারের দুই ভগ্নিপতি, মত্তুর বাপ ও আলেটেকের আব্দুস সালামের বাবা। বেশিভাগ মানুষই বাইরের জেলার হবার কারণে ও টঙ্গী এলাকা নগরায়নের ফলে শত শত শহিদের নাম কালের অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে। শহিদদের অনেককেই বিসিক কবরস্থানে কবর দেওয়া হয়।

আরিচপুর গণহত্যায় শহিদদের স্মরণে কাজী মোজাম্মেল হক (বর্তমান মাননীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী ও এম.পি), হাসান উদ্দিন সরকার, জয়নাল আবেদীনসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচেষ্টায় বিসিক শিল্প এলাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে শহিদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়।[২৬]

৪

একাত্তরের বৈশাখ মাসের ৪র্থ দিন। দিনটি ছিল ১৮ এপ্রিল রবিবার। পাকিস্তানি সেনারা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে প্রবেশ করতে থাকে। পাকিস্তানি সেনারা আজকের এই দিনে সিলেটে প্রবেশ করে তাদের তাণ্ডব করে।

রাজাকারদের সহযোগীতায় গভীর জঙ্গল থেকে তুলে নিয়ে হত্যা

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের ভুড়ভুড়িয়া চা বাগানের একটি স্থান সাধুবাবার গাছথলা। পাকিস্তান আমলে এই বটগাছের নিচে একজন সাধুর আস্তানা

ছিল। এখানে চা-শ্রমিক ও বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ মানত করত, পূজা দিত। জায়গাটি 'সাধু বাবার থলি' নামে পরিচিত ছিল। ভুড়ভুড়িয়া চা বাগানটি ভাড়াউড়া চা বাগানের ফাঁড়ি বাগান। শ্রীমঙ্গল শহর থেকে এই বাগানের দূরত্ব মাত্র আধা কিলোমিটার। শ্রীমঙ্গল-ভানুগাছ সড়কের পাশে এই বাগানের অবস্থান। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এই বাগানে প্রায় ১১শ শ্রমিক কর্মরত ছিল। বাগানের ব্যবস্থাপক ছিলেন পাকিস্তানি শওকত আলী খান। বাগানের কিছু শ্রমিক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেয়ার কারণে তিনি তাদের মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। পাকিস্তানি হানাদাররা শ্রীমঙ্গলে ক্যাম্প স্থাপনের পর প্রায়ই এই বাগানে আসা যাওয়া করতো। পাকিস্তানি হানাদারা ভাড়াউড়া চা বাগানের শ্রমিকদের হত্যা করার পর বাগান জুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। শ্রীমঙ্গলের প্রায় সকল বাগান থেকেই চা শ্রমিকরা বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয় তথা সীমান্তের ওপারে চলে যায়। কিন্তু কিছু কিছু শ্রমিকরা বাড়িঘরের মায়া ছাড়তে না পেরে রয়ে যায় নিজ ঘরে। দিনে ঘরে থাকলেও রাতে তারা চলে যেত গভীর জঙ্গলে। কান খাড়া রাখত কোথায় কি হচ্ছে। চতুর রাজাকার বাহিনী গোপনে গোপনে খবর রাখত চা শ্রমিকদের অবস্থানের। দালালদের চোখ পড়েছে ভুরভুরিয়া ফাঁড়ি এই বাগানের দিকে। দুপুরে পাকিস্তানি হানাদাররা বাগানের শ্রমিক কলোনিতে প্রবেশ করে। অস্ত্রের মুখে তারা শ্রমিকদের মোরগ ও খাসি ধরে দিতে বলে। এরপর তাদের মধ্যে থেকে ৩০ জন শ্রমিককে ধরে শ্রীমঙ্গল ইপিআর ক্যাম্পে ধরে এনে বাঙ্কার খননের কাজ করতে বাধ্য করে। এরপর তাদের মধ্যে থেকে ১৬ জন শ্রমিককে নিয়ে যায় পার্শ্ববর্তী সাধুবাবার গাছতলার বধ্যভূমিতে। ছড়ার পাশে দাঁড় করে গুলি করা হয়। দুজন ছাড়া সবাই সেদিন হানাদারদের গুলিতে শহিদ হন। এছাড়াও এই বাগানের আরো কয়েকজন শহিদ হন। কিন্তু তাদের সঠিক নাম পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে পাকিস্তানি হানাদাররা এখানে ১০-১৫ দিন গণহত্যা চালায়।[২৭]

দশ বছরের বালকও রক্ষা পায়নি

৪ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল) সকালে পাকিস্তানি বাহিনী কয়েকটি সামরিক জিপ নিয়ে সিলেটির জকিগঞ্জে এসে পৌঁছায়। তাদের স্বাগত জানান স্থানীয় রাজাকার আলবদরেরা। পাকিস্তানি সেনাদের আগমন সংবাদ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় দালালেরা। রাজাকাররা বিলম্ব না করে ১৪৪ ধারা নিজেরাই ঘোষণা করেন। এ সময় দশ বছরের একটি বালক জরুরি কাজে

বাজারে এসেছিল। ফরিদ উদ্দিন নামের অবোধ সেই বালককে রাস্তায় কুকুরের মতো গুলি করে হত্যা করে। তারপর থেকে অসংখ্য মানুষের উপর নির্যাতন চালিয়ে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে দেয়।[২৮]

পরিচয় পত্র দেওয়া কথা বলে নিয়ে যায়

৩ বৈশাখ (১৭ এপ্রিল) পাকিস্তানি বাহিনী সিলেটের রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল বর্তমানে ক্যাডেট কলেজ থেকে একজন সেনা স্টার চা বাগানের মালিক রাজেন্দ্র লাল গুপ্তের বাসভবনে দেখা করতে আসে। এর পরদিন ৫ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল) সকাল দশটায় তারা তারাপুরে যায়। সংক্ষিপ্ত রাস্তা বলে মালনিছড়া চা বাগানের মধ্য দিয়ে আখালী ইপিআর ক্যাম্পে চলে যায়। ফেরারা পথে আবার রাজেন্দ্রলাল গুপ্তের বাসভবনে প্রবেশ করে।

অসৎ উদ্দশ্যকে আড়াল করে গুপ্ত পরিবারের প্রতিটি পুরুষ সদস্যকে '*ডান্ডি কার্ড/পরিচয়পত্র*' প্রদান করার কথা বলে। পাকিস্তানি সেনারা আরো বলে,"*ডান্ডি কার্ড প্রদান করার পরই তারা অবাধে চলাফেরা করতে পারবে। স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করা সম্ভব হবে। তাই এই পরিবারের প্রত্যেকের 'ডান্ডি কার্ড' দরকার।*"

পাকিস্তানি বাহিনী ওই দিনই ডান্ডি কার্ড ইস্যু করার কথা বলে প্রত্যেক সদস্যদের সাথে রাজেন্দ্রলালকে মডেল স্কুলে যেতে বলে। রাজেন্দ্রলালা পাকিস্তানিদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেও তার কাছে আর কোনো পথ ছিল না। কারণ বাড়ির চারদিকে শত শত সেনা ছিল।

পরিবারের সকল সদস্য, বাগানের কর্মচারী ও শ্রমিক সবাইকে পাকিস্তানি বাহিনী জড়ো করে গুপ্ত বাড়িতে। শ্রমিকদের ঘরে ঘরে চৌকিদার পাঠিয়ে তাদেরও নিয়ে আসে। গাড়ি ভর্তি করে সবাইকে নিয়ে যাত্র শুরু করে মালনিছড়া বাগান হয়ে।

গাড়িতে ওঠার সময় গুপ্ত বাবু বাড়ির পাহারা দেয়ার জন্য ছেলেদের বাড়িতে রেখে যাওয়ার অনুরোধ করে। পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যরা রাজেন্দ্র গুপ্তের এক ছেলে পঙ্কজ কুমার গুপ্তকে বাড়িতে থাকার অনুমতি দেয়। বাকি সবাইকে নিয়ে চলে যায়।

মালনীছড়া চা বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের বাংলোর পাশে সবকটি গাড়ী থেমে যায়। গাড়ী থেকে বের করে আনে সবাইকে। মালিক, কর্মচারী ও শ্রমিক তিন ভাগে বিভক্ত করে। ধরে আনা লোকজনকে টিলার তিন পাশে তিনজন সুবেদারের নেতৃত্বে তিনটি দলকে নিয়ে যায়। এর পরে তাদের গুলিবর্ষণ করা হয়। সেই আক্রমণে ৩২ জন শহিদ হন।[২৯]

জীবন বাঁচাতে অন্য গ্রামে আশ্রয় নিলেও রক্ষা হয়নি

লালমনিরহাট শহরের নিকটবর্তী গ্রাম চড়োগাছ। এই গ্রামে ১৮-১৯ এপ্রিল গণহত্যা সংঘটিত হয় এবং এই গণহত্যায় ১০-১২ জন শহিদ হয়েছেন। কয়েকজন শহিদের নাম হলো- মোঃ হারিসউদ্দিন, পঞ্চানন নন্দ রায়, হরিশচন্দ্র রায়, দুর্গাকান্ত রায়।

উল্লেখিত শহিদদের সকলের বাড়ি চড়োগাছ গ্রামে। এই গণহত্যায় রামজীবন গ্রামের আনসার আলীসহ আরো কয়েকজন শহিদ হয়েছেন যাদের নাম জানা যায় নাই। শহিদদের বেশিরভাগ ছিলেন বাইরের লোক। তারা নিরাপত্তার স্বার্থে অন্য গ্রাম হতে ঐ গ্রামে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন।[৩০]

প্রশ্ন করা হয় তোমরা বাঙালি না বিহারি?

৪ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল) যশোর সদর উপজেলার নওয়াপাড়া ইউনিয়নের বাহাদুরপুর গ্রামে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সকাল ৮টার দিকে প্রবেশ করে। গ্রামের দুদিক দিয়ে তারা সাধারণ নিরীহ গ্রামবাসীদের আটক করে নিয়ে যায় পশ্চিম দিকে কামারবাড়ি জঙ্গলের কাছে। জনমানবহীন ঐ জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে তাদের কাছে প্রশ্ন করা হয়- *তোমরা বাঙালি না বিহারি?*

আটককৃতদের কেউ কেউ বলে আমরা মুসলমান। তখনই শুরু হয় নির্মম মারধর ও নির্যাতন। সেসময় পাকিস্তানি সেনারা বলতে থাকে বাঙালিরা মুসলমান নয়। এরপর একজন মেজরের নির্দেশে ৪ জন সেনা গুলি করে নির্মম গণহত্যা ঘটায়। কিছুক্ষণ পরে সবাই মারা গেছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য পুনরায় গুলি চালায়। এখানে কমপক্ষে ৫০ জনকে হত্যা করা হয়। এই গণহত্যায় শহিদদের স্মরণে যশোর-মাগুরা মহাসড়কের পাশে বাহাদুরপুর বাজারে একটি স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হয়েছে।[৩১]

লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যা

পাকিস্তানি বাহিনীর বিশাল বহর চুয়াডাঙ্গা থেকে মেহেরপুর আসার পথে মেহেরপুরের আমঝুপিতে আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানি সেনারা আমঝুপি ফার্মের কাছ থেকে গুলিবর্ষণ করতে করতে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। তাদের বেপরোয়া গুলিতে অনেকে হতাহত হয়।

পাকিস্তানি সেনারা আমঝুপি ব্রিজ পার হয়ে কোলার মোড়ে ১১ জন সাধারণ গ্রামবাসীকে একত্রিত করে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে। পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে ৯ জন শহিদ হন। ঐ দিনে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণে আমঝুপি গ্রামের ২৩ জন নিরীহ মানুষ শহিদ হন।[৩২]

যাকেই সামনে পেয়েছে তাকেই হত্যা করেছে

৪ বৈশাখ (১৮ এপ্রিল) পাকিস্তানি বাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শাহবাজপুর গ্রামে হামলা চালিয়ে বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। যাকে সামনে পায় তাকেই ধরে নিয়ে হত্যা করে। এদিন সাতঘড়িয়া পাড়ায় মনিন্দ্র নাগ, সাহা পাড়ার সুশীলি রানি সাহা ও নেপাল চন্দ্র সাহাকে হত্যা করা হয়। একই দিন শাহবাজপুর ইউনিয়নের ধীতপুর গ্রামের ডা. হীরা মিয়া (পল্লী চিকিৎসক), আলী হোসেন, কদু মিয়া ও তাঁর ছেলে ফুল মিয়া গণহত্যার শিকার হন। এর কয়েকদিন পর রাজামারিয়াকান্দি গ্রামে হামলা চালিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী দুই সহোদর দুলা মিয়া ও মোমিন মিয়া এবং মনসুর আলী ও আবদুস সহিদকে হত্যা করে। শাহবাজপুর গ্রামের বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় হামলা চালিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী ব্যাপক লুটপাট, অগ্নিসংযোগ এবং নির্যাতন করেছে।[৩৩]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রণক্ষেত্রে রূপান্তর

পাকিস্তানি সেনারা ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের তাদের ঘাটি গড়ে তোলে। কলেজের সমস্ত জিনিসপত্র লুট করে। এ অপকর্মে আগ্রহী ছিল বিহারিরা। ১৮ এপ্রিল ১২ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন ইকবাল কলেজের অধ্যাপক হালিম খানকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর হত্যা করে কলেজের মালী সাত্তার ও চৌকিদার সাইজুদ্দীনকে। এভাবে হত্যা করে বাঙালিদের লাশগুলো ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া সড়কের সেতুর নিজে ফেলে দেওয়া হয়। এখানে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করা হয়েছে বলে গানা যায়।[৩৪]

[চলবে]

তথ্যসূত্র

১. *The Events in East Pakistan, 1971*, A Legal Study by The Secretariat of the International Commission of Jurists, Geneva, 1972, p.24
২. Ibid, p. 24-25
৩. এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান, এস আর মির্জা, *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর: কথোপকথন*, প্রথমা, ২০০৯, পৃ. ৪৬-৪৭
৪. Yelena Biberman & Rachel Castellano (2017): "Genocidal Violence, Nation-Building, and the Bloody Birth of Bangladesh", *Asian Security*, DOI: 10.1080/14799855.2017.1335712
৫. বিস্তারিত: আহম্মেদ শরীফ, *মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যার প্রকৃতি ও স্বরূপ : ১৯৭১*, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, ২০২০
৬. যুগান্তর, ২ বৈশাখ ১৩৭৮ (১৬ এপ্রিল ১৯৭১),
৭. যুগান্তর, ২ বৈশাখ ১৩৭৮ (১৬ এপ্রিল ১৯৭১), পৃ. ৫
৮. আহম্মেদ শরীফ, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ: বগুড়া জেলা, ১৯৭১*: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৮, পৃ. ৬৭-৬৮

৯. নিত্যদ্যুতি সরকার, *রংপুর গণহত্যা*, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৭, পৃ.- ১১-৩০
১০. মোজাম্মেল বিশ্বাস, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ: দিনাজপুর জেলা*, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৯, পৃ. ৯৭-৯৮
১১. জয়নুল হোসেন, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা*, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৯, পৃ. ৩৬-৩৭
১২. আজহারুল আজাদ জুয়েল, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ: লালমনিরহাট জেলা*, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৯, পৃ. ২৭
১৩. তপন পালিত, গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ: মৌলভীবাজার জেলা, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৯, পৃ. ৪০-৪১
১৪. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ : ২য় খণ্ড*, সময়, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৮-২৯
১৫. সুমা কর্মকার, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ: নাটোর জেলা*, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৮, পৃ. ৩৫
১৬. তপন পালিত ২০১৯ : ৬৯
১৭. মো. মাহবুবর রহমান ও তাহসিনা শারমিন, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ: রাজশাহী জেলা*, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৮, পৃ. ২৯
১৮. বেগম নূরজাহান (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে কুষ্টিয়া*, গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩৮
১৯. সুমা কর্মকার ২০১৮ : ৪০-৪১
২০. প্রাগুক্ত : ৫১
২১. অমল কুমার গাইন, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ: খুলনা জেলা*, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৮, পৃ. ১৩-৩৫
২২. জয়নুল হোসেন ২০১৯ : ৪০
২৩. বেগম নূরজাহান ২০১৩ : সম্পা.
২৪. মুকুল মোস্তাফিজ, মুক্তিযুদ্ধে রংপুর, গতিধারা, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৬৩
২৫. তাজুল মোহাম্মদ, *সিলেটে গণহত্যা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৮৮-৮৯
২৬. আলী ছায়েদ, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ: গাজীপুর জেলা*, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০২০, পৃ. ৪৫
২৭. তপন পালিত ২০১৯ : ৬৯-৬১
২৮. তাজুল মোহাম্মদ ২০০৫ : ৭৬-৭৭
২৯. কাজী সাজ্জাদ আলী জহির ২০১৮ : ১৮৬-১৮৭
৩০. কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস : সিলেট*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৩৩
৩১. শংকর কুমার মল্লিক, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ: যশোর জেলা*, ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৯, পৃ. ২৬
৩২. রফিকুর রশীদ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : মেহেরপুর জেলা*, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১১৭-১১৮
৩৩. জয়নুল হোসেন ২০১৯ : ৪০-৪১
৩৪. ডা. এম. এ. হাসান, *গণহত্যা যুদ্ধাপরাধ ও বিচারের অন্বেষণ*, ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস্ ফাইন্ডিং কমিটি, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩৯৭